দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 29 APR 2008
পৃষ্ঠা — কলাম

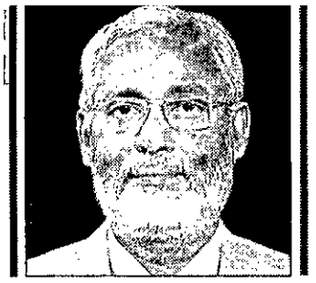

শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার

বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে শিক্ষা সংস্কার নিয়ে মাঝে-মধ্যেই আলোচনা হয় এবং সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে চিন্তা-ভাবনা হয়। সেই অনুসারে তাদের কারিকুলাম রিভাইজ হয় এবং তাদের শিক্ষকদের যোগ্যতাও পুনঃনির্ধারণ হয়। আমাদের দেশে বেশ কয়েকটি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে অতীতে এবং অনেক সুপারিশও পেশ করা হয়েছে কিন্তু বলতে গেলে অনেক সুপারিশই বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে আছে, তার কোনটি বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা, মনে পড়ে না। যাক সে কথা, ইদানিংকালে দু'টি প্রসঙ্গ খুব জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে– একটি হলো, একমুখী শিক্ষা নীতি আর দ্বিতীয়টি হলো, পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার। কাঠামোগত প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা নির্ধারণ করা। দু'টিই শিক্ষার মানের সঙ্গে জড়িত। একমুখী শিক্ষানীতি সরকার বেশ কিছুদিন আগে চালু করবে করবে বলে আবার চালু করেনি কিছু লোকের বিরোধিতার মুখে। এই বিরোধিতার মোকাবিলা করা উচিত ছিল সরকারের এবং একমুখী শিক্ষার বাস্তবায়ন করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কয়েকদিন আগে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র করার ক্ষেত্রেও কিছু সংস্কারের কথা বলা হয়েছে, সেখানেও অনেকে রাজী হয়েছেন এবং বলেছেন এটা করা উচিত। আমার কথা হলো দুটোই করা দরকার। কিন্তু সরকার যদি ঠিক সময়ে পদক্ষেপটি নিতে পারতো তাহলে কিন্তু দু'টোই হয়ে যেতো। এখন সরকার শুধু পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সংস্কারের কথা চিন্তা করছেন। আমি এ প্রসঙ্গে আসার আগে, একমুখী শিক্ষানীতির কথা বলতে চাই। সরকারের যে চিন্তা-ভাবনা ছিল একমুখী শিক্ষানীতির, তা কিন্তু একদম সঠিক ছিল। কিন্তু সরকার যে পথে এগিয়েছিলেন, সে পথটি ঠিক ছিল না। যেমন– একমুখী শিক্ষানীতির জন্য তারা কিছু লোককে বিদেশেও পাঠিয়েছিলেন, প্রশিক্ষণও দিয়েছিলেন, একটি নির্দিষ্ট বছর থেকে তা চালু করার কথাও বলেছিলেন, কিন্তু যে কাজটি তারা করেনি তা জনসাধারণকে অর্থাৎ অভিভাবককে, শিক্ষাবিদদেরকে সম্পৃক্ত করে, আলোচনা করে, একটা নীতি গ্রহণ করা। এ কাজটা যদি সরকার করতেন তাহলে যারা তখন বিরোধিতা করেছিল, তারা হয়তো করতো না। কেন একমুখী শিক্ষানীতি দরকার– এর কারণ হলো আমাদের দেশে '৬০-এর দশকে একটা ভুলনীতি চালু হয়েছিল। নাইন পাস করার পর কেউ বলছে আমি বিজ্ঞানী হবো, কেউ বলছে মানবিক শাখায় পড়বো, কেউ বাণিজ্য বিভাগে পড়বো– এরকম। খুব আরলি স্পেশালাইজেশন, পৃথিবীর কোথাও স্কুল পর্যায়ে এ ধরনের আরলি স্পেশালাইজেশন হয় না। এতে একজন ছাত্রের পরিপূর্ণ জ্ঞান আহরণ থেকে অনেক ঘাটতি থেকে যায়। একজন বিজ্ঞানের ছাত্র সে নিজের এবং অন্য দেশের কবি-সাহিত্যিকদের কথা জানবে না, একজন সাহিত্যিক তিনি কম্পিউটার সাইন্স ও টেকনোলজির মূল নীতিগুলো জানবেন না, কিভাবে বিজ্ঞান মানুষের জীবনকে বদলে দিচ্ছে, বিশ্বের চেহারা পাল্টে দিচ্ছে, সেই সম্পর্কে একটা ধারণা থাকবে না। এক কথায় ভাষা, অংক, সমাজপাঠ, বিজ্ঞান, ইতিহাস সব জিনিসগুলো নিয়েই কিন্তু কমপ্রিহেনশন এক্সামিনেশন। আমাদের সমাজে, এই যে করাপশনের কথা বলছি, যত লোককেই ধরি না কেন, শাস্তি দেই না কেন– সেই করাপশন বন্ধ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত একেবারে গোড়াতে ভালো মানুষ করবার তাগিদ আমরা দেব। এমনকি এই কাজটি শুরু করতে হবে একেবারে শিশুদের পর্যায় থেকে। আজকে যদি আমরা সেটা শুরু করি হয়তো দশ বছর, পনের বছর পর তার ফল পাবো। যে লোকগুলো ভালো মানুষ হয়ে গড়ে উঠছে তাদের কাছে সমাজের খারাপ কাজের আশংকা পাওয়া যাবে না।

তাই আগে থেকে স্পেশালাইজেশান করার কোন কারণ নেই। পৃথিবীর অন্যত্র এ ব্যবস্থা নেই। আমাদের দেশে এটা চালু করে এর কুফল আমরা পেয়েছি। আমরা দেখেছি যারা প্রকৌশলীতে গেছে তারা হিউমেনিটিজের অনেক কিছু জানে না। তারা বিজ্ঞানের সাধারণ সূত্রগুলো জানে না। এরকমভাবে একটা দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে উঠে না। সুতরাং আমাদের একমুখী শিক্ষা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে এবং এটা করা উচিত ছিল। কিন্তু এই একমুখী শিক্ষা করতে হলে নানান ধরনের শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষক লাগবে। কিন্তু আমরা যদি এই জাতীয় পর্যায়ে পদার্থবিদ্যার জন্যে, গণিতের জন্যে, করি, আমরা যদি তাদের মনস্তত্ত্ব ও পড়াবার কেপাবিলিটি দেখি, তাদের অভিজ্ঞতা দেখি, এবং এগুলো বিচার-বিবেচনা করে যদি একটা লিফলেট তৈরি করি এবং সেখান থেকে যদি শিক্ষক নেয়া হয় তাহলে বিজ্ঞান শিক্ষার একটা সুফল পেতে পারি। সুতরাং একমুখী শিক্ষা করতে গেলে বর্তমান শিক্ষকদেরকেই চালাতে হবে– এমন তো কথা নয়। বর্তমানে শিক্ষকদের সংখ্যা তো খুবই অপ্রতুল। এবং যে কথা অন্যান্য বিদেশী সংস্থা বলে, যে, আমাদের দেশের শিক্ষকদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। কারণ একজন শিক্ষকের জন্যে অনেক অনেক শিক্ষার্থী। তাই আমাদের ছেলে-মেয়েরা যারা ফেল করছে তাদেরকে যদি আমরা শিক্ষায় নিয়োজিত করি এবং আমরা যদি ভাল শিক্ষাদান করতে পারি তারচেয়ে ভাল দেশ গড়ার কাজ আর কি হতে পারে। কিন্তু এই কাজটা করা হয়নি। সুতরাং, জনসাধারণের মনে একটা সন্দেহ জেগে উঠেছিল তখন এবং অনেকে যারা বিরোধিতা করেছিল তারা বলেছিল একমুখী শিক্ষা দিতে গেলে তাদের তো কোন ট্রেনিং নেই। এই ট্রেনিংটা না দিয়ে কেন শুরু করা হলো, আমার কথা হচ্ছে এই ট্রেনিং ঠিক আছে, আমরা যদি একটা তারিখ ঠিক করি যে, এক বছর পড়ে আমরা করবো, এই এক বছরের মধ্যে যাদেরকে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হতে পারে এবং নতুন লোক নিয়োগ করা যেতে পারে, জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা করে এদেরকে একটা এক্সটেনসিভ ট্রেনিং দেয়া যেতে পারে– এই কাজগুলো তো দুঃসাধ্য বলে কিছু নয়। কিন্তু কাজগুলো যেভাবে করা উচিত ছিল, আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি সেভাবে করা হয়নি। আর সরকারের একটা টেনডেনসি আছে কেউ কোনরকম বিরোধিতা করলে সরকার তাকেই যেন বেশি তোয়াজ করতে শুরু করে এবং তার মতামতকেই বেশি মূল্য দেয়। সরকার তো বলতে পারতো কেন তোমরা এর বিরোধিতা করছো। আসো একটা ওয়ার্কশপে আসো, সব ধরনের পন্ডিতরা এখানে আসুক, এখানে এসে বলুক যে, আমরা কি আংশিকভাবে একটা শিক্ষিত লোক চাই, না আমরা একটা কমপ্রিহেনশিপ এডুকেশনের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে একটা নলেজ ইকোনোমির যুগে টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিতে যে আমরা বাস করছি, আমাদের ছেলে-মেয়েরা যদি বিদেশি ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে কাউন্টার পার্ঠে চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারে, তাহলে একমুখী শিক্ষার দরকার কিনা। তখন হয়তো সবাই বলবে হ্যাঁ। সুতরাং এই কাজটা যে দরকার আছে সরকারের যে ইচ্ছা আছে, কিন্তু সরকারের ওয়ার্কিংটা আমি মনে করি ঠিক হয়নি, যাক্ দেরিতে হলেও সরকার আর একটি পদক্ষেপ নিয়েছে সেটা হলো পরীক্ষার সংস্কার। আমরা পরীক্ষা করি স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করার জন্যে নয়। এটা কোন দেশেই করা হয় না। সেই ব্রিটিশ আমল থেকে এখন পর্যন্ত আমাদের যে পরীক্ষা পদ্ধতি রয়েছে সেটা মান্ধাতা আমলের। একজন শিক্ষক তিন চার বছরের প্রশ্ন সামনে নিয়ে বসেন, তারপর দেখেন গত বছর এটা আসছে কিনা, তার আগের বছর আসছে কিনা। সুতরাং ঐটা একটু ঘুরিয়ে দেন এবং ওই রকম একটা প্রশ্ন করেন, যেটা কমন যে গত বছর এসেছে, এবার আসবে না– এই রকমভাবে প্রশ্ন তৈরি করা, সেই প্রশ্নের মধ্য থেকে পরীক্ষা নিয়ে দেখা যায় যতই সে স্টার পাক বা গ্রেড ফাইভ পাক, তারা কিন্তু জীবনে খুব ভাল করতে পারছে না। কারণ এটা মোস্টলি

পানি যে নিম্নমুখী আমাদের নদ-নদীতে কোথাও পলি পড়ে, অনেক জায়গায় দেখা গেছে যে, নদীতে স্রোত নেই, অল্প বৃষ্টি হলেই বন্যা হচ্ছে, এই প্রিন্সিপালটা যে নদ-নদীর সঙ্গে সম্পৃক্ত, জীবন ও পরিবেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত এটা বলা দরকার, আমরা $(a+b)^2$ শিক্ষাচ্ছি, যে ফর্মুলা শিখাচ্ছি $a^2+2ab+b^2$ কিন্তু একটা বাগান করতে হলে যে ফর্মুলার দরকার এটা কখনো বলা হয় না। মানে স্কুলে যেগুলো পড়ানো হয় সেগুলো যে জীবন এবং পরিবেশের প্রুফ করা এটা যদি আমরা ছোটবেলা থেকেই শিখাই তাহলে কিন্তু হয়। এখন আমি পরীক্ষার সময় হলের মধ্যে গিয়ে তাকে আমি এরকম প্রশ্ন করবো, কাঠামোগত মানে সৃজনশীল প্রশ্ন করবো, পরীক্ষা হলের মধ্যে গিয়ে শুধু মেধা যাচাই করবো তা কিন্তু ঠিক নয়। ক্লাসে যখন পড়ানো হবে তখন থেকেই কিন্তু এর ট্রেনিং দিতে হবে। শিক্ষক ক্লাসে যখন এটা পড়বেন তখনই বলবেন যে বলতো দেখি এই জিনিসটা-টু সাইড অব ট্রাংগেল গ্রেটার দেন থার্ড সাইড। তখন এই কথা না বলে যদি বলা যায় দু'ইঞ্চি, তিনি ইঞ্চি, পাঁচ ইঞ্চি দিয়ে কি একটা ট্রাংগেল আঁকা যায়, তাহলে আঁক। এটা যে ভাল করে বুঝে, সে সঙ্গে সঙ্গে বলবে এই সাইড দিয়ে একটা ট্রাংগেল আঁকা যায় না, কারণ দুই ইঞ্চি আর তিন ইঞ্চি যোগ করলে তো পাঁচ ইঞ্চি হবে। কিন্তু থিউরিতো বলে যে, লিটল সাইড অব এ ট্রাংগেল আর গ্রেটার দেন দি থার্ড সাইড। অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকটা ব্যবহারকে যদি প্রয়োগমুখী করি, এরকম হিউমেনিটি এর ক্ষেত্রেও সত্যি। সুতরাং আমরা ক্লাসে থেকে যদি এরকম সৃজনশীলভাবে পড়াই তাহলে কিন্তু পরীক্ষায় কোন অসুবিধা হবে না। একটা কথা মনে রাখতে হবে আমাদের কাজ কিন্তু ছাত্রদের ঠকানো না, বা ছাত্র কি জানে না, এটা আমাদের কাজ না, আমাদের কাজ হলো ছাত্র কি জানে সেটা বের করে আনা এবং সেই জীবনে সেটা প্রয়োগ করতে পারে কিনা, এই কাজটা করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। প্রতিটি বিষয়ে আলাদা-আলাদা করে যদি একটা প্রশ্ন ব্যাংক তৈরি করি তাহলে এটা তৈরি করা খুবই ডিফিকাল্ট নয়। একটা রেন্ড অব এক্সেসেস নাম্বার দিয়ে প্রশ্ন ব্যাংক থেকে আমরা প্রশ্ন নিতে পারি, তাহলে প্রশ্ন আউট হওয়ার কোন সম্ভাব না আর থাকবে না। তাহলে ছাত্রদের মনেও প্রশ্ন জাগতে পারে প্রশ্নটা গত বছর এসেছে, এবার আসবে না তার পরের বছর এই প্রশ্নটা আসতে পারে। এ রকমভাবেই কিন্তু প্রশ্ন করা দরকার। এখানেও কেউ কেউ মনে করছেন বিশেষ করে অভিভাবকরা বলছে যে, এটা ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে হোক, এটা ষষ্ঠ শ্রেণী থেকেও হতে পারে এমন কি সব শ্রেণী থেকেই হতে পারে। একেবারে ছোটকাল থেকেই হতে পারে। তাতে কোন আপত্তি নেই, ভাবটা যদি এরকম থাকে আমার সময়টা পার হয়ে যাক তারপর নতুন সিস্টেম চালু হোক– এটা ঠিক হবে না। আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতি সরকার শুরু

আগে আমরা দেখি। তাদেরকে ফেসিলিটিটা বিলডাপ বেশি করে দিতে হবে।

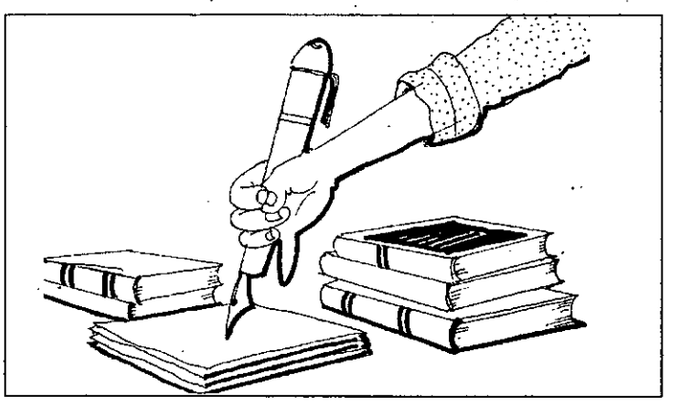

আজকে আমরা নানারকম করাপশানে জড়িয়ে পড়ছি। মামলা করছি। কিন্তু একজন শিক্ষক যদি শিক্ষকতার জন্যে চাঁদা দিয়ে চাকরিতে ঢুকতে হয়, যে শিক্ষক চাঁদা দিয়ে ঢুকলেন– সে কি করে চাঁদাবাজমুক্ত ছাত্র গড়ে তুলবে। সুতরাং এইখানে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যেখানে যোগ্য লোক, নিজের মেধায় ঢুকতে পারে। চাঁদাবাজি যেন না করতে হয়। আরেকটি কথা যে কথা আগেই বলছিলাম বিশেষ করে গ্রামের ছেলে-মেয়েরা। আমাদের শহরের ছেলে-মেয়েরা ভাল শিক্ষকের কাছে পড়ালেখা করে, কি করে ভাল রেজাল্ট করা যায়, একটা সৃজনশীল উপায়ে কিভাবে পড়াটা মনে থাকে ইত্যাদি চিন্তা করতে পারে। কিন্তু গ্রামের ছেলে-মেয়েদের সে উদ্যোগ নেই। পশ্চিমবঙ্গে সরকারী স্কুলে প্রাইভেট টিউশনি একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। আমাদের কিন্তু সাহসের সঙ্গে এটা করা উচিত ছিল। কেউ কেউ হয়তো বলবেন প্রাইভেট টিউশনি বন্ধ করে দিলে যে সব ছেলেরা একটু কম পড়ে তারা বুঝবে কেমন করে, সেখানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে সেই বুঝাটা কি কেবল শহরের ছেলেদেরকেই বুঝাতে হবে, না গ্রামের ছেলেদেরও বুঝার একটা অধিকার আছে। একটা সময় ছিল যখন গ্রাম থেকে মেট্রিকে, ইন্টারমিডিয়েটে ভাল রেজাল্ট করতো, বাসায় কাজ করে এরকম ছেলে-মেয়েরাও লেখাপড়া করে বেরিয়ে আসতো এখন কিন্তু সেই জিনিসটা আর হচ্ছে না। তাহলে কি মেধা এখন শহরমুখী হয়ে গেছে। গ্রামগুলো কি ভুলে গেছে, না ট্যালেন্টটা আনতে পারছে না। এজন্যে আমার একটা প্রস্তাব হলো আমরা যদি কোন ন্যাশনাল লেভেলে ভাল কোন শিক্ষক, যিনি ভাল করে বুঝাতে পারেন, যার যোগ্যতা আছে এরকম কিছু শিক্ষককে দিয়ে যদি আমরা এলজাবরা, জিওমেট্রি, ম্যাথমেটিক্স, ত্রিকোণমিতি ভাল করে শেখাতে পারি, আমরা যদি সিডি করতে পারি সেই সিডিগুলো যদি আমরা গ্রাম পর্যায়ে কমিউনিটি সেন্টারে এসে ছাত্ররা এগুলো দেখে তাহলে তাদের বাইরে টিউশনি পড়তে হবে না, কারণ তারা তখন খুব ভাল করে বুঝে যেতে পারে এই যে সৃজনশীল পদ্ধতিগুলো যদি একাধিকবার বলে দেয়া হল তখন কিন্তু একটা মেন্টাল ওরিয়েনটেশান আসে এবং আমি মনে করি সরকারের উচিত হবে যে, এই রকম সিডি ব্যবহার করা এবং সিডিকে এখন শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ করা। ICT-ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি নিজেই যখন একজন শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে–এটা কিন্তু সরকারকে বুঝাতে বেগ পেতে হচ্ছে। এটা কিন্তু অবশ্যই সরকারের বিবেচনায় আসতে হবে, তা না হলে সরকারের নিজের ICT-এর নীতির সঙ্গে সরকারের শিক্ষানীতির একটা দারুণ সংঘর্ষ থেকে যাবে, দেশের প্রতি আমার যে কনসার্ন তা থেকে বলতে পারি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে যে স্টুডিও আছে, ICT-এর এডুকেশনের ব্যবস্থা আছে, আমাকে যদি কেউ এই দায়িত্ব দেয় যে, এসএসসি এবং এইচএসসির যে ক্যাসেটগুলো করলে গ্রাম-গঞ্জের ছেলে-মেয়েরা উপকৃত হবে সেই ক্যাসেটগুলো কর, আমি সানন্দে সেই জিনিসগুলো করবো। আমরা বিজ্ঞান একাডেমী থেকেও এটা করতে পারি। এটাতে কোন আপত্তির কিছু থাকবে না, বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ না হলেও এটা দেশের কাজ যেহেতু আমার সুযোগ আছে সেহেতু এ কাজটা করতে আমার অনাগ্রহ হওয়ার কথা না।

আমাদের আশেপাশের দেশগুলো কিন্তু আজকে দেশের অভিভাবক হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে–তার একটি মাত্রই কারণ তারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে অবশ্যই পরিবর্তনের একটা হাতিয়ার হিসাবে বেছে নিয়েছে। তাদের দেশগুলো তখন মেন্যুফ্যাকচারাল দেশে পরিণত হয়েছে